ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 523-531
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.039

সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 10.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The role of employees is extremely important in the smooth running of any organisational management. The organisation has to make arrangement to meet their expectations and demands to increase the initiative of these workers. Reasons for employee needs and in order to find the ways to increase the motivation of employees Maslow's 'Need Hierarchy Theory', Herzberg's 'Two Factor Theory', Victor H. Vroom's 'Expectancy Theory', Douglas McGregor's Theory X and Theory Y, all these theories arise.

However, due to the different social, economic, political and cultural environment of the East and the West the needs and expectations of the people living in both places are different. As a result, it is not possible to find out the reason for the motivation of the people living in the Eastern Countries with the help of Western Centric Theory.

Swami Vivekananda did not give any theory or model like western thinkers in managing the organisation. Based on the social problems of India, he focused on the demands, needs of the people of homeland.

Both public and private organisations are formed in order to fulfill the needs and supply of the people. As the workers working in the organisation are part of the society, various issues arising from the socio-economic environment and situation influence their thoughts and based on this their expectations, needs and demands are developed. The existing socio-economic problems that existed during Swami Vivekananda's time are still present but the style has changed a bit. Even today, the discrimination mentality among people is present on the basis of cast, religion, gender and wealth. Employees can give importance to contemporary education, character building, dignity of women, elimination of social discrimination, increase self-confidence and self reliance in any organisation. As expectations, demands will be met their motivation to work will also increase. Which will have a positive impact on the organisation.

Keywords: Swami Vivekananda, Organization, Motivation, Employees, Demand.

সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পাদন করে। এই প্রেষণা জাগরণের ক্ষেত্রে সংগঠন হতে এমন কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় যা মানুষের স্বাভাবিক চাহিদার অন্তর্গত। এগুলি পূরণ হলেই মানুষের উৎপাদনশীল মানসিকতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিজ কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সহজতর হয়। মানুষের প্রেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণালাভের প্রয়োজনে প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যেমন- আব্রাহাম মাসলোর 'চাহিদা-সোপান তত্ত্ব' (Need Hierarchy Theory), ফ্রেডরিখ হার্জবার্গের 'দ্বি-উপাদান তত্ত্ব'(Two Factor Theory), ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের 'এক্স তত্ত্ব ও ওয়াই তত্ত্ব' (Theory X & Theory Y), ভিক্টর এইচ. ভ্রুমের 'প্রত্যাশা তত্ত্ব' (Expectancy Theory) প্রভৃতির কথা বলা যায়, যেগুলির মাধ্যমে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে ধারণা ও সেই ভিত্তিতে তাদের প্রেষণা জাগরণের জন্য সংগঠন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ভারতীয় দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের মতো তথাকথিত কোন প্রেষণা তত্ত্ব বা সূত্র উপস্থাপিত করেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন রচনা, বক্তৃতা, কথোপকথন ও কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে আমরা তাঁর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হই। পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত তথা পাশ্চাত্য ভ্রমণের মাধ্যমে জনজীবনের সংস্পর্শে এসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সুখ-দুঃখ, অভাব -অভিযোগ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাই সংগঠনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এবং মানবিক আচরণকে সদর্থক দিকে পরিচালিত করে তিনি ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মানুষের বিভিন্ন প্রত্যাশা, মানুষের জীবনে আগত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের নিরিখে প্রেষণা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা ও সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় তার প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পাই।

স্বামী বিবেকানন্দ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মানবসম্পদের বিকাশ। মানুষ যখন ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে নিজ ভাবনাকে সদর্থক দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে; ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, জড়তা, স্বার্থপরতার উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে সমগ্রের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে সমর্থ হবে সেদিন সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধন সম্ভব হবে। একই কথা সংগঠনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে সংগঠনের সর্বস্তরের সমস্ত কর্মী নিজেদের প্রেষণা জাগরিত করতে সক্ষম হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিজেদের কার্যসম্পাদনে অগ্রণী হবে এবং সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে সেই সম্পর্কিত দিকগুলি এখানে আলোচনা করা হলো---

১) প্রকৃত শিক্ষার ভূমিকা: মানুষের জীবনে পার্থিব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও চেতনা জাগরণের জন্য শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে চাহিদা সুনিশ্চিতকরণের জন্যই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের জন্য স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় অনুসন্ধানের সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেন-- 'যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে

দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা...বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না'।[১]

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে যা মানুষের প্রেষণা জাগরণেও সহায়ক হয়। তিনি বলেন 'Education is the manifestation of the perfection already in man'।[২] প্রকৃত শিক্ষা হলো সেই যা মানবপ্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করে তার পূর্ণতা বিকাশের সহায়তা করে। স্বামীজি মনে করেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে উপার্জনের জন্য প্রচলিত পন্থার বাইরেও নিজেদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ে যেতে হবে। দেশীয় শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি-প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোলের সাথে পাশ্চাত্যের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি-প্রযুক্তি সম্পর্কেও সমানভাবে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন, যাতে মানুষ যুগোপযোগীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। তিনি বলেন--- 'আমাদের চাই কি জানিস--- স্বাধীনভাবে স্বদেশীবিদ্যার সাথে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো, চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে, লোকে... দু পয়সা করে খেতে পায়'।[৩]

শিক্ষা মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলে। তিনি ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেখানকার দরিদ্র মানুষদের সাথে ভারতের দরিদ্র মানুষদের পার্থক্য লক্ষ্য করলেন এবং অনুভব করলেন যে শিক্ষার অভাবে ভারতে দরিদ্রদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন---'ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দারিদ্র্যেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পরিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা--- জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ---ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন'।[4]

তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের মধ্যে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন--'জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না, উচ্চশ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্নশ্রেণিতে বিস্তৃত হইবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে চেষ্টা চলিতেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে, উহাকে জাগাইতে হইবে'।[৫]

কৃষি শিল্প সহ যে কোন সংগঠনের অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন সেখানের কর্মচারীগণ অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। বিবেকানন্দ সেই কারণে কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করার কথা বলেন। ব্যক্তি যখন দেশীয় শিক্ষার সাথে বিদেশী ভাষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তখন তার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও কর্মস্থলে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। আবার সংগঠনেও যুগোপযোগী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে কর্মচারীগণ নতুন বিষয়গুলি আয়ত্ত করে আরও ভালোভাবে নিজ কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হন।

২. চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বদান ও মানবসম্পদ গঠন: মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, আয়-বৈষম্য হ্রাস এগুলির প্রয়োজনীয়তা সমাজ তথা সংগঠনে থাকলেও এগুলি উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি

নয়। উপযুক্ত মানবসম্পদের মাধ্যমেই যে কোন দেশের সামগ্রিক বিকাশসাধন হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ---'টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কী করতে পারে? মানুষ চাই-- যত পাবে ততই ভালো'।[৬]

একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষের ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি পাক, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সকলের জীবন ভরে উঠুক, জীবনের মান উন্নত হোক, কিন্তু বাইরের সম্পদ অর্জনের সাথে সাথে মানুষকে নিজে অন্তরের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। সত্যানুরাগ, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, নিঃস্বার্থপরতা, উদারতা এগুলি হল অন্তরের সম্পদ। এই অন্তরের সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেন ---'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও কর্ম সম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম বলিতেছি না। যে ভাবধারা পশুকে মানুষের ও মানুষকে দেবতার পরিণত করে তাহাই ধর্ম'।[৭] ধর্ম মানুষকে সৎ, সুন্দর, উদার, প্রেমপরায়ণ, নিঃস্বার্থ, সাহস ও চরিত্রবান হতে সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন দেশের সামগ্রিক বিকাশসাধনের জন্য প্রয়োজন মানুষ তৈরি করা। ব্যক্তি চরিত্রগঠনের মাধ্যমে নিজ মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তিনি যুবসমাজকে প্রেরিত করার উদ্দেশ্যে বলেন-- 'বীরের মতো এগিয়ে চলো। একদিন বা এক বছরের সফলতা আশা কোরো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো, দৃঢ় হও, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দাও.... সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির কাছে চিরবিশ্বস্ত হও, তাহলেই তুমি জগত কাঁপিয়ে তুলবে। মনে রাখবে-- ব্যক্তিগত 'চরিত্র' ও 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নয়"।[৪] তবে তাঁর কাছে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের তথা দেশের মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ভাবনা প্রাধান্যলাভ করেছে। কোন মান-সম্মান, পুরস্কার বা নামযশের চাহিদার উর্ধ্বে উঠে সেবা মনোভাব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখে সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ভাবনাই তাঁর চিন্তাধারায় স্থানলাভ করেছে। তিনি বলেন---'বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের প্রয়োজন নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়--- তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পরিণত হয়, তার চেষ্টা করো, হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নামযশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পিছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ করো'।[৯] মানুষ নিজস্ব চরিত্রকে গঠন করতে পারলে ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিতে শিখলে সমাজ তথা সংগঠন থেকে অসাধুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হবে এবং সংগঠনের সকল বিষয় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। এভাবে ব্যক্তি নিজস্ব আচরণের সদর্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে সংগঠনকে উপকৃত করতে সক্ষম হবে। সংগঠনের কর্মীগণ যদি ব্যক্তিগত রেষারেষি ও সংকীর্ণ মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে পুরস্কার, নাম যশের চাহিদার উর্ধে উঠে নিঃস্বার্থ মানসিকতা ও সেবাভাব নিয়ে কর্ম সম্পাদন করার প্রেরণা পান তবে সেটি নিঃসন্দেহে এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

৩. নারীশক্তির মর্যাদা: স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সীমিত সামাজিক ও আইনগত সংস্কার আন্দোলনের থেকে ভারতে নারীজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই সেটি তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন--- 'ভারতের দুই মহাপাপ--- মেয়েদের পায়ে দলানো, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা'।[১০]

নারী ও পুরুষ --উভয়েই সমাজ তথা দেশের অংশ। দেশের সামগ্রিক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন পুরুষের সাথে নারীরাও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিকশিত করতে সক্ষম হবে। তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করে লক্ষ্য করেন, সেখানে মহিলারা পুরুষদের মতই শিক্ষলাভের সুযোগ পায়, স্বাবলম্বী হয়ে উপার্জন করে। সর্বত্র তাদের অবাধ বিচরণ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন ---'বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসর--- সব কাজ করে... যাদের পয়সা আছে তারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত।[১১] ভারতেও পুরুষদের মতই নারীদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরও কর্মস্থলে পুরুষদের অনুরূপ সুযোগ প্রদান করতে হবে। কর্মস্থলে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নারী বলে কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কখনোই তার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। 'আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী; বরং আমরা যেন ভাবি যে, আমরা মানুষ মাত্র জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের জন্ম'।[১২] যে কোনো প্রতিভা নিহিত থাকে মানুষের মধ্যে ---সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না। কেন সংগঠনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের কার্য সম্পাদিত করে চলেছে। নারীরা পরিবার সমাজ উভয়ের কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হলে, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ পেলে তখন তারাও কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায় এবং তার ফলে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

৪. সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ: স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন ভারতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার, কুপ্রথা ও আচারসর্বস্বতার ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষজন অপমানিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত হয় এবং সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিবেকানন্দ মনে করেন সামাজিক পশ্চাৎপদতার শিকার দরিদ্র নিম্নজাতির মানুষদের জীবনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন ---'সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকারের জাতি, যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে.... তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে... আসুন, আমরা তাহাদের মাথার ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই--- কার্যটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে'।[১২] এই দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের মূলস্রোতে আসার সুবিধার্থে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। যার ফলে তারাও নিজেদের বিকশিত করার প্রেষণা লাভ করে এবং আরো ভালোভাবে নিজেদের কার্য সম্পাদন করতে পারে। তিনি বলেন---'প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও অবশ্যক, যাতে গরিব লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়।... প্রত্যেক লোক যাতে আরও ভালো করে খেতে পায় এবং উন্নতি করবার আরও সুবিধা পায় তা করতে হবে'।[১৪] বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ও ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের অবস্থার পার্থক্য উপলব্ধি করে বলেছেন---'যদি কারুর আমাদের দেশে নীচুকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশে [পাশ্চাত্যে] সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, সুবিধা আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মান্য হবে। আর সকলের দরিদ্রের সহায়তা করতে ব্যস্ত'।[১৫]

একজন মানুষের পক্ষে একাধিক কাজ সমান দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেজন্য বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ করে থাকেন। সেই ভিত্তিতে জাত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সমাজে

প্রতিটি কাজের জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন,সেটি জুতো সেলাই হোক বা চণ্ডীপাঠ। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন---'Cast is a natural order, I can perform one duty in social life, and you another; you can govern a country and I can mend a pair of old shoes, but that is no reason why you are greater than I, for can you mend my shoes? Can I govern the country? I am clever in mending shoes, you are clever in reading the Vedas, but that is no reason why you should trample on my head'.[১৬]

যে কোনো সংগঠনে বিভিন্ন কাজের ধরণ ও ক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ,ভাষা সংস্কৃতির মানুষের আগমন ঘটে। তারা একসাথে কাজ করার সুযোগ পায়।যেমন-- একটি শিল্পকারখানায় সাফাইকর্মী, দ্বাররক্ষীর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শ্রমিক,প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, ম্যানেজার, ডিস্ট্রিবিউটারের উপস্থিতিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এতে সমাজের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এতে প্রত্যেকেই সুষ্ঠভাবে কাজ করার প্রেরণালাভ করে।

৫. আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ও আত্মশক্তির উপলব্ধি : স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন মানুষকে নিজে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিজের উপর আস্থাস্থাপন করতে হবে এবং নিজের হীনমন্যতাকে দূর করতে হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজের কর্মও সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তাই আত্মবিশ্বাসের জাগরণ সম্পর্কে তিনি বলেন---'পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছুই করতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে যথোচিত যত্নবান হও না বলেই বিফল হও। যখনই কোনও ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার বিনাশ হয়'।[১৭] তাঁর মতে---'লক্ষ্যবস্তুর প্রতি অবিচল থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ নিজ কাঙ্খিত লক্ষ্যকে অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন---'ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁচচ্ছ, থেমো না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবেনা'।[১৮]

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রমের সাথে মনের একাগ্রতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বামীজি মনে করেন। তিনি বলেন---'অর্থোপার্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক--- যে কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে কাজটি ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে'।[১৯] আত্মশক্তির যথাযথ উপলব্ধির ফলে মানুষ আত্মপূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। এর জন্য মন থেকে নেতিবাচক ভাবনা দূর করে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল---'যদি জড়-জগতে বড় হতে চাও, তবে বিশ্বাস করো-- তুমি বড়। আমি হয়তো ছোট্ট একটা বুদ্বুদ, আর তুমি হয়তো পাহাড়ের মত বিশাল ঢেউ, কিন্তু জেনো আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রয়েছে; অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান থেকে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করো'।[২০] সুতরাং বলা যায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হওয়া যায়। সংগঠনে কর্মরত কর্মীগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং একাগ্রভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে কার্য সম্পাদন করে তাহলে সংগঠনও নিজ নির্ধারিত লক্ষ্যপূরণে সফল হয়। এখানে বিবেকানন্দের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাই প্রমাণিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার জনজীবনের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রত্যাশা, চাহিদা, অভাব, অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হন এবং তারা কিভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে বা কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করলে সমাজ তথা দেশের বিকাশসাধন হবে সেই সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিবেকানন্দের ভাবধারার সাথে আমেরিকান চিন্তাবিদ্ আব্রাহাম মাসলোর 'চাহিদা যোগান তত্ত্ব'(Need Hierarchy Theory)-এর অনেকাংশে মিল লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদা সোপান বিদ্যমান। এগুলো যথাক্রমে--- জৈবিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, আত্মমর্যাদার চাহিদা, আত্মপূর্ণতা চাহিদা। এগুলোর মধ্যে প্রথম চাহিদাপূরণ হলে মানুষ দ্বিতীয় চাহিদাপূরণে তৎপর হয়। এভাবে ক্রমানুসারে চাহিদাপূরণ হতে থাকলে মানুষ চাহিদার অন্তিম স্তরে পৌঁছায়। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন অন্ন- বস্ত্র- বাসস্থানের চাহিদাপূরণ হলে, সামাজিক নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা রক্ষিত হলে মানুষ আত্মপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বামীজি দেখেছেন, পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনে বাহ্যিক সম্পদের অভাব প্রাচ্যের মানুষদের তুলনায় কম। কিন্তু তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা আছে, আবার প্রাচ্যে বিশেষত ভারতের জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার অভাব সেভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও পার্থিব সম্পদের অভাব রয়েছে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মানুষদের চাহিদার মধ্যে কিছুটা হলেও ভিন্নতা রয়েছে। তিনি বলেন -- 'আমরা চাই বা না চাই পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করে গোটা দেশকে খেয়ে ফেলার উপক্রম করেছে।...আমরাও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করতে পারবো না। সম্ভবত কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে আবার সম্ভবত একটু আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন।[২১] তবে তিনি পাশ্চাত্যের দেশ গুলি থেকে ভাষা যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান কারিগরিব প্রযুক্তিবিদ্যা কে গ্রহণ করার কথা বলেছেন তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রবণতার প্রশংসা করেছেন তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন--'সম্ভবত অন্য জাতির কাছ থেকে আমাদের কিছু বহির্বিজ্ঞান শিখতে হবে, কিভাবে সংঘ গঠন করে পরিচালনা করতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অল্প চেষ্টায় ফললাভ করতে হয়, তাও শিখতে হবে'।[২২]

সমাজে বাস করা ব্যক্তিদের বিভিন্ন চাহিদা ও যোগান সুচারুরূপে মেটানোর লক্ষ্য নিয়েই সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন গড়ে উঠেছে। সেখানে কর্মরত কর্মীরা সমাজেরই অংশ। তাই তাদের প্রত্যাশা, দাবি, চাহিদা কিরূপ হবে সেটি সংগঠনের ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সহ সমসাময়িক প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রেষণা জাগরণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত সেই সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের দিকনির্দেশগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। আর্থিক সুবিধাদানের সাথে সংগঠনের কর্মীগণের অন্যান্য দিকগুলিও বিবেচনা করা উচিত। যেকোনো সংগঠনের কাজগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই সাবেকী পদ্ধতির সাথে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠনের কার্যপ্রণালীকে গড়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সংগঠনের তরফে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে কর্মীগণ প্রচলিত প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। কর্মীগণ যাতে নিজেদের চারিত্রিক মর্যাদা বজায় রেখে কর্মস্থলে

কর্মসম্পাদনা করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন প্রকার দুর্নীতি, অসাধুতা, চোরাকারবারীর সাথে আপোস না করেন সেজন্য সংগঠনে নিয়মাবলী প্রণয়নের সাথে শাস্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যাতে কোন কর্মচারীর সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চলভেদে বৈষমামূলক আচরণ না করা হয় সেদিকে সংগঠনের কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে। সর্বোপরি, কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার সুযোগ প্রদান করা, সুস্থ প্রতিযোগীতার পরিবেশ যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংগঠনের কর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, কোন কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে সংগঠনের ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত হবে সেই সম্পর্কে সংগঠনের কর্মীদের কাছে সময়ে সময়ে ফিডব্যাক নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলস্বরূপ সংগঠনের কর্মীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ কার্য বিনা প্রতিবন্ধকতায় সম্পন্ন করতে পারবে ও কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করার প্রেরণা লাভ করবে। তবেই একটি সংগঠনের পক্ষে নিজের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সুগম হবে।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ১০৭।

২. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ১।

৩. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ২৬০।

৪. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০১, পৃষ্ঠা- ২৫৪।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ৪৫০।

৬. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০১, পৃষ্ঠা- ২৯৫।

৭. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ৫৫।

৮. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০১, পৃষ্ঠা- ১৯২।

৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ৩৩৭।

১০. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০১, পৃষ্ঠা- ১৭২।
১১. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা-৩৮৮-৩৮৯।
১২. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ২০৭-২০৮।
১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ৪৩৫-৪৩৬।
১৪. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০১, পৃষ্ঠা- ২৬-২৭।
১৫. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ৩৮৯।
১৬. Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-III), Advaita Ashrama, Calcutta, 1962, P-245.
১৭. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৩২।
১৮. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০২, পৃষ্ঠা- ৩৩৭।
১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৬৭।
২০. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৫৮।
২১. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৭-২৮।
২২. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০০৩, পৃষ্ঠা- ৩১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, *স্বামী বিবেকানন্দ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০০।
২. মুখোপাধ্যায়, জীবন, *স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ*, ওরিয়েন্টাল বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, ১৯৭২।